ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী, সংখ্যা ৬৪
চৈত্র ১৪২১-জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/এপ্রিল-জুন ২০১৫

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল

ড. ইব্রাহিম খলিল*

Abstract: *Climate change is one of the much talked about issues of recent times. It is entirely based on clear scientific analysis and explanations, and it is considered the root cause of increasing intensity and velocity of cyclone disaster around the world which becomes evident if the disaster situation of Asia region for the last 30 yaers is analyzed. People living in the coastal areas around world will be severely affected by the disaster emanated from climate change. In Bangladesh, life and livelhihood of the coastal people especially agriculture and people associated with agriculture will be severely affected. As aresult, food security of the region in particular and the country as a whole would be jeoparadized, and millions of farmers will take shelter in towns and other places of their choice loosing livelihood opportunities. Under such circumstances, this article discusses the impact of climate change on the coastal farmers and their coping strategies with the impending adverse affect of climate change.*

১.০ ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি গভীর ভাবনার বিষয়। পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদগণ মনে করেন বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে দুর্যোগের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। বিগত ৩০ বছরে এশীয় অঞ্চলে দুর্যোগের চিত্র বিশে-ষণ করলে এটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন: ১৯৭১-৭৫ সময়ে ৭৪টি, ১৯৭৬-৮০ সময়ে ১২৬টি, ১৯৮১-৮৫ সময়ে ১৩৮টি, ১৯৮৬-৯০ সময়ে ১৫৯টি, ১৯৯১-৯৫ সময়ে ১৭৬টি এবং ১৯৯৬-২০০০ এই পাঁচ বছরে ২০৫টি দুর্যোগ আঘাত হেনেছে।[১] দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইন্টার গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন কাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)। বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায়। প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ৯,৩৮০ বর্গ কিলোমটার বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বহু সংখ্যক দ্বীপ, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকার অংশ।[২] এই ফানেল আকৃতির কারণে এখানে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।[৩] বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন এ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ১৫টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস করে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক।[৪] ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে উপকূলীয়

---

* পিএইচডি গবেষক,আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

১ দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগষ্ট ২০০৪, পৃ.১।

২ বাংলাপিডিয়া, "উপকূলীয় ব্যবস্থপনা" ভুক্তি।

৩ A. K. Gain and M. A. Bari,"Effect of Environmental Degradation on National Security of Bangladesh," Asia Pacific Journal on Environment and Development, vol. 14, no.2[December 2007]:18.

৪ এম. জসিম উদ্দিন, "উপকূলের কোটি মানুষের জীবন ঝুঁকিমুক্ত কবে হবে?," দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০৭, পৃ.১৩।

এলাকায় জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মারাত্মকভাবে। কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য-নিরাপত্তা ব্যপকভাবে হুমকির মুখে পতিত হবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। সুতরাং বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের টিকে থাকা ও অভিযোজন কৌশল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাকর্ম সম্পাদণ সংশি-ষ্ট বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করবে ও উপকূলে বসবাসকারী কৃষকদের vulnerability কমিয়ে এনে একটি স্থিতিস্থাপক কৃষক কমিউনিটি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তনের প্রেতি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের টিকে থাকা ও অভিযোজন কৌশল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহহলোঃ

ক) বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের উপর প্রভাব জানা এবং

খ) বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রেতি কৃষকদের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যের নিরিখে গবেষণা প্রবন্ধটি অনুসন্ধান ও বিশে-ষণাত্মক ধরনের। এটি প্রাথমিক (Primary) ও সহায়ক (Secondary) এ দু' ধরনের উপকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এজন্য প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বই, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন, দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িকী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে পূবেই তৈরিকৃত একটি চেকলিস্টের ভিত্তিতে ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে স্বল্প সময়ে ধারণা লাভের জন্য বাংলাদেশের ৫২টি উপকূলীয় উপজেলা থেকে উপকূলীয় জেলা বরগুনাধীন পাথরঘাটা উপজেলাস্থ পদ্মা গ্রামটি Shoreline এ অবস্থিত হওয়ায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে এটি নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত গ্রামের ৩২জন কৃষকে নিকট এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সীমিত সম্পদ, সময়ের স্বল্পতা ও গবেষণার আকার ছোটো হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণা এলাকা ও উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা গ্রামে ৪৪০টি খানায় ২২৭২ জন লোক রয়েছে। এর মধ্যে ২২৯টি পরিবার ভূমিহীন।[৫] ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা দৈনিক শ্রম অথবা নিকটস্থ সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। ধনীকৃষক পরিবারের সদস্যগণ একদিকে যেমন বাড়তি উৎপাদনের সুফল ভোগ করেন অন্যদিকে তাঁরা আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে

5 Bureau of Statistics, Population Census 2001, Community Series: Zila: Barguna, Dhaka: BBS, Governmnet of Bangladesh, 2006, 46.

অর্থোপর্জন করে সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। ফলে এ দুটি শ্রেনীর কৃষকদের অভিযোজন কৌশল ভিন্ন ধরনের। এজন্য এদরকে বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য Target জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য না করে যে সকল মানুষের ০.৫ শতক বা তার বেশি কৃষি জমি রয়েছে ও যারা নিজেরাই কৃষি কাজ করে থাকেন এবং জীবন ধারণের জন্য যারা কেবল কৃষির উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ খানা প্রধানগণ অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক কোন খাতেই কর্মে বা ব্যবসায় নিয়োজিত নন, এমন ৩২ জন কৃষক বাছাই করে ৪টি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে ১.৩০-২.০০ ঘন্টা ধরে আলোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পূর্বেই একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে ৪টি Focus Group Discussion(FGD) পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন, তাদের এলাকায় এর প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ে কৃষকদের ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কৃষকদের অভিযোজন কৌশল জানতে হলে বাংলাদেশে জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। সেজন্য প্রবন্ধটির প্রথমে বাংলাদেশে বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তন ও বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ক গবেষণার মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশে-ষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০ বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তন: ধারণা ও প্রত্যয়

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রপঞ্চ। সূর্য থেকে যে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসে তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগে কিছু রশ্মি মহাশূন্যে ফিরেও যায়। যে রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছে তা কিছু পরিমাণ শোষিত হয়ে তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং কিছুটা ভুপৃষ্ঠে পৌঁছে। এ রূপান্তরিত শক্তি বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত জলীয়বাষ্প O2, NO2, CH4, O3 প্রভৃতি শোষণ করে এবং পৃথিবীকে উষ্ণ বা গরম রাখে। এসব গ্যাসগুলোকে বলা হয় গ্রিনহাউজ গ্যাস। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে বয়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্ত অন্যান্য গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণের পিছনে মানুষের প্রত্য ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। যেমন : কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে তিকর গ্রিনহাউজ গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে নির্গত অর্ধেকেরও বেশি কার্বন নির্গম করে পাঁচটি দেশ যেমন: চীন, আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও জাপান।

ক্র.নং.	কার্বন নির্গমনকারী দেশ	মোট বাৎসরিক নির্গত কার্বনের পরিমান(মেগাটন)
১	চীন	৯,৪৪১
২	আমেরিকা	৬,৫৩৯
৩	ভারত	২,২৭৫.৪৫
৪	রাশিয়া	১,৯৬৩
৫	জাপান	১,২০৩

উৎস: দি ডেইলি স্টার ডিসেম্বর ৩, ২০১১, পৃ.১ ও ডিসেম্বর ১৪, ২০১১, পৃ.১৪

নির্গমের শীর্ষ তালিকায় পরবর্তী ৫টি দেশ হচ্ছে ব্রাজিল (১,১৪৪ মেগাটন), জার্মানী, কানাডা, মেক্সিকো ও ইরান। বৃটেন ভিত্তিক ফার্ম ম্যাপলক্রফট এর মতে, উলি-খিত ১০টি

দেশ বিশ্বে মোট কার্বন নির্গমনের দুই তৃতীয়াংশ কার্বন বায়ুমণ্ডলে নির্গমনের জন্য দায়ী। চীন কয়েক বছর আগেই আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যায়। যদিও চীন ও ভারতে মাথাপিছু নির্গমন অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু এ দু'টি দেশে সামগ্রিক জ্বালানী চাহিদা অনেক বেশি। ব্রাজিলের নির্গমন আরো বেশি হবে যদি বনউজার বিবেচনায় আনা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে রাশিয়ার নির্গমন কমে যায় কিন্তু বর্তমানে নির্গমন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে।[৬] ১৯৯৭ সালে যখন কিয়োটো প্রটোকল স্বারিত হয় তখন ৩৭টি দেশ যারা মোট নির্গমনের ৬০ শতাংশের জন্য দায়ী কার্বন নির্গমনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু বিগত দেড় দশকে চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল থেকে কার্বন নির্গমনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার উক্ত ৩৭টি দেশের অংশ ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে।[৭] বিশ্বব্যাপী গড় মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের পরিমান ২ টন এর বিপরীতে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপরিয়ান ইউনিয়নের অবদান যথাক্রমে ২০ টন, ১৬.৪ টন ও গড়পরতা ১০-১২ টন। ভারত নির্গমন করে ১.৩ টন। কার্বন নির্গমনের বিচারে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান মাথা পিছু প্রতি বছর মাত্র ০.৩ টন। কিন্তু অন্যদের ভোগবিলাসিতার জন্য আমাদের দেশকে প্রতিবছর জীবনহানি ও সম্পদ ক্ষতির ক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।[৮]

জলবায়ুর পরিবর্তন পর্যবেণের জন্য ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের Inter Govermnetal Panel on Climate Change(IPCC) গঠন করা হয়। IPCC 2007 সালের ৬ এপ্রিল আন্তঃ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ৪র্থ প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে কেউ এ নিয়ে ভাবেননি। রিপোর্ট প্রকাশের পর এ নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। জাতিসংঘের আন্ত রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (IPCC) এর তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫-২.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (২.৭-৪.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক তৃতীয়াংশ প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন হবে। তা ছাড়া এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের একশ কোটিরও বেশি লোক ২০৫০ সালের মধ্যে ব্যাপক তির মুখোমুখি হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো তলিয়ে যেতে পারে। আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের খরা আরও বাড়বে। রিপোর্টে বলা হয় বিশ্বের তাপমাত্রা ২১০০ সালের মধ্যে ১.১ ডিগ্রি থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়তে পারে।[৯] গ্রিনহাউজ গ্যাসের স্তর বাড়ার ফলে ফলে পৃথিবী হচ্ছে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর। যাকে বলা হয় গে-াবাল ওয়ার্মিং। এর ফলে বিশ্বজলবায়ুতে পরিবর্তন হচ্ছে যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি সৃষ্টি করছে।

৩. ০ বাংলাদেশে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বৈশ্বিক এ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি হবে ঘনবসতির বাংলাদেশ। এ দেশের দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে আছে বঙ্গোপসাগর। উজান থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদ-নদী জালের মত বিছিয়ে আছে পুরো দেশটিতে। এ নদীগুলো তাদের

৬ দি ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ৩, ২০১১, পৃ.১

৭ দি ডেইলি স্টার নভেম্বর ৩০, ২০১১ পৃ.১।

৮ Asadullah Khan, "Our vulnerability to Climate Change,"Dhaka: The Daily Star, November 26, 2011.

৯ বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯, ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ. ২১৭।

মোহনায় মিলেছে বঙ্গোপসাগরে। এ দেশের প্রকৃতি, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ সাগর। এটি কাজ করছে দেশের সংকট ও সম্ভাবনার উৎস হিসাবে। বঙ্গোপসাগর মূল ভূখণ্ডের দিকে ফানেলের মতো মুখ করে আছে। ফানেলের মতো মুখ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত ১৮০ বছরে ৫৭টি বড় ধরনের সামুদ্রিক ঝূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ওপর আঘাত হেনেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস বৃদ্ধির পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের আন্ত রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (IPCC) এর তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। IPCC এর গবেষণা মতে, কার্বন নির্গমনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ সেন্টিমিটার হতে ৫৯ সেন্টিমিটার এ উন্নীত হবে। Institute for Water Modelling এর গবেষণা প্রতিবেদনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়লে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ৮৪ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে।[১০]

যে হারে বর্তমানে উষ্ণতা বাড়ছে তাতে আইপিসিসি এর হিসাব অনুযায়ী উষ্ণতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের আবাদি জমি নষ্ট হবে প্রায় ১৪ শতাংশ এবং ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ বনভূমি ধবংস হতে পারে, জলমগ্ন হতে পারে আরও প্রায় ১৫.৮ শতাংশ জমি। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৫, বরিশালের ৯৯, পটুয়াখালীর ১০০, নোয়াখালীর ৪৪ এবং ফরিদপুরের ১২ শতাংশ এলাকা ডুবে যেতে পারে। অর্থাৎ দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষকে উদ্বাস্থ হয়ে নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে দেশের উঁচু ও শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে তা গত ১০ বছর ধরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। বর্ষার সময় বৃষ্টিপাত কম হওয়া, সঠিক সময়ে শীত শুরু না হওয়া, প্রতি বছর তাপমাত্রা অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পাওয়া ও কালবৈশাখী ঝড়ের সংখ্যা কমে যাওয়াকে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে বিচেনা করা হয়ে থাকে। ২০০৬ সালে বর্ষার সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। ভরা মৌসুমে বৃষ্টি না হয়ে দেশের অনেক স্থানে অসময়ে নেমেছে প্রবল বৃষ্টি।[১১] ২০০৪ সালের জুলাই মাসের শুরু থেকেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং উজানে এই বৃষ্টিপাত ২০০৪ সালের জুলাই মাসের শুরুতে ব্যাপক বন্যার কারণ হয়েছে। ২০০৩ সালে ভরা বর্ষার কয়েক মাসসহ সাত মাসই বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের তুলনায় কম। এ মাসগুলো হলো-জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, মে, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর। অপরদিকে মার্চ ও জুলাই মাসে বৃষ্টি হয়েছে অস্বাভাবিক রকম বেশি। মার্চ মাসে হয়েছে স্বাভাবিকের প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯৩ শতাংশ। আর জুন মাসে হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হওয়ার কথা জুলাই মাসে। কিন্তু ২০০৩ সালে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাকির তুলনায় ২৯ শতাংশ কম। বৃষ্টিপাত ছাড়াও ২০০৩ সালের শুরু থেকেই ছিল অস্বাভাবিকতা। শীত খুব ঝেঁকে বসতে না বসতেই আঘাত হানে দুটি শৈত্য প্রবাহ। এ দুটিই ছিল এমন প্রবল যে, তাপমাত্রা

১০ তদেব।

১১ দৈনিক সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১।

২০০৩ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে যায়। দুবারই মৌসুমের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধানও কমে যায়। এর আগে এমনটি কখনও দেখা যায়নি।

প্রাক মৌসুম পূর্বে (বর্ষার আগে) এ অঞ্চলের স্বাভাবিক কালবৈশাখী, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়ের পরিবর্তে বেশি হয়েছে বজ্রপাত। টর্নেডো প্রায় হয়নি; হয়নি ঘূর্ণিঝড়ও। তবে একাধিক নিম্নচাপ হয়েছিল এবং সে ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিকতা ছিল। এর পরে গ্রীষ্মে ছিল শীতের মতো অস্বাভাবিকতা প্রথমত, গ্রীষ্মের তীব্রতা ছিল বেশি। তারপর একাধিক 'হিট ওয়েব'। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড যদিও অতিক্রম করেনি। এ ধরনের 'হিট ওয়েব' আসার কথা মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু এসেছে অনেক পরে। আবহাওয়ার এসব অস্বাভাবিকতা একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার ফল, অন্যদিকে তেমনি এসব অস্বাভাবিকতা আবার পরিবেশকে বেশি করে বিঘ্নিত করে। ফলে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে দুর্যোগ।[১২] যেমন : ঘূর্ণিঘড় ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকা ডুবে গেলে দেশের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে। পানি নিচের দিকে সরে যাওয়ার সুযোগ না থাকার ফলে সে সব এলাকা আটকে পড়া পানিতে ডুবে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে নদীগুলোর পানির উচ্চতাও বাড়বে। ফলে নদী উপচে যাওয়া পানিতে দু'তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যাবে। বাড়বে বন্যার ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব। উজান থেকে আসা নদীর পানি ও অতিবর্ষণ এবং সাগরের জোয়ারের পানি সব মিলে এক দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি করবে।[১৩] বিশেষ করে কৃষিখাত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

৪.০ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হওয়া প্রভাবিত হচ্ছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে ২০৩০ সাল নাগাদ মৌসুমী বৃষ্টিপাত বেড়ে যাবে ১০-১৫ শতাংশ এবং শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫-১০ শতাংশের বেশি। এতে শস্য উৎপাদন বা কৃষি পদ্ধতিতে পরিবর্তন দেখা দেবে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে খরাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এতে করে বাধাগ্রস্ত হবে কৃষি উৎপাদন, কৃষি নির্ভর সমাজে জীবন ও জীবিকার ধরন যাবে পাল্টে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে গ্রীষ্ম ও বর্ষার ফসল হিসেবে আউশ ও আমন জাতীয় ধানের ফলন বাড়বে, কিন্তু কমবে উষ্ণ মৌসুমের গম, আলু ও ডাল জাতীয় রবিশস্যের ফলন। একই সঙ্গে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিকর পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশ বৃদ্ধি এসব ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।[১৪] শস্য বীজ সঠিক উৎপাদন দিবে না, জমি হারিয়ে ফেলবে স্বাভাবিক ক্ষমতা, জৈব সার তার স্বাভাবিক তেজ হারিয়ে ফেলবে, জলসেচে দেখা দিবে চরম সংকট।

---

১২ দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

১৩ ধীরাজ কুমার নাথ, "বায়ু পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদন", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ৮৬-৮৭

১৪ মাহফুজ উল-াহ, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ২৭৪-৭৬।

দেশে প্রতিনিয়ত কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বাড়িঘর নির্মাণ, কৃষিজমিতে কারখানা গড়ে উঠা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিন ২২০ হেক্টর কৃষিজমি বিনষ্ট হচ্ছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কৃষিজমি কমে যাবে। আবহাওয়ার উষ্ণায়ন বাড়তে থাকলে কৃষি জমি ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার পরিমাণ বাড়বে। প্রতিবছর নদী ভাঙন এর ফলে ১০,০০০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।[১৫] জলবায়ু পবির্তনের ফলে কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার হার আরও বাড়বে। এতে উপকূলে বসবাসকারি অনেক কৃষক উদ্ভাস্ত হয়ে পড়বে। ফলে প্রান্তিক চাষিদের জীবন ও জীবিকা হবে বিপন্ন।

তিব্বত, ভুটান, ভারত ও নেপাল থেকে নেমে আসা বরফগলা পানির কারণে প্রতিবছরই সাগরের পানি বেড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হচ্ছে।[১৬] ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দণি উপকূলে জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর গবেষণা মতে, উপকূলীয় ও তীরবর্তী ১৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার মাটি জলোচ্ছ্বাসজনিত কারণে লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি আরো ১৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে আরো ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় ভূমি তলিয়ে যাবে ও লবণাক্ততা আরও ভেতরে আসবে। এ লবণাক্ততার কারণে কেবল চাষাবাদই নয় বরং খাদ্যের অভাবে গবাদি পশুর সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।[১৭] বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর কৃষি বর্তমানে যন্ত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এতে একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস যুক্ত হচ্ছে অন্যদিকে কৃষি জমি জৈব সার থেকে বঞ্চিত হয়ে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে রাসায়নিক সারের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে। উপকূলীয় ১০-১৫ বছর পূর্বে এলাকায় যে সব ফসল চাষ হতো বিশেষ করে ধানের যে সব জাত চাষ হতো (যেমন : রাজা শাইল, গিরমি, হাইট্রা ইত্যাদি) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেগুলো চাষ করা এখন আর লাভজনক হচ্ছে না। তাছাড়া, নতুন জাতের ধানে পোকার উপদ্রব বেশি হওয়ার কারনে এবং কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কারণে কীটনাশকেরও যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে যা মানব শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে এবং রোগ-ব্যধি বেড়ে চলেছে।

৫.০ উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় আজ পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা অভিজোজন বা খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নাম অভিযোজন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতি যতবেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ততই তা সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।[১৮] এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয়

১৫ দনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

১৬ গাজী তানজিয়া, "জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘণ্টাধ্বনি, পৃ. ১৭।

১৭ তদেব।

১৮ মাহফুজ উল-াহ, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ২৭৪-৭৬।

কৃষকরা তাদের ঘরবাড়ি অপোকৃত উচুঁ স্থানে তৈরি করছে। ঘরবাড়ি তৈরির সময় তারা ঘরের উচ্চতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখছেন। ঘরের উচ্চতা এমন ভাবে দিচ্ছেন যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বয়ে যাওয়া বাতাস যেন তাদের ঘরে বেশি না লাগে; আবার এমন নিচু নয় যে জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য ঘরের পিড়ার (Plinth) উচ্চতা ৩-৪ ফুট এবং ঘরের উচ্চতা ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত দিয়ে থাকেন। শক্ত ভিত্তির উপর নির্মিত চৌচালা ঘর অনেকটা ঝড় সহনীয় বলে ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকরা জানান।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ইতোমধ্যে চারণভূমি কমে গিয়েছে বহুলাংশে। যে কারণে দরিদ্র জনগণের অর্থ উপার্জনের কর্মকাণ্ড হিসেবে গবাদিপশু বিশেষ করে ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন অসম্ভব হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আয়ের পথ অর্থাৎ স্থানীয় নদী-নালাগুলোতে মাছের ছোট ছোট পোনা ধরাকে বেছে নেয়।[১৯] কিন্তু এগুলো ধরতে গিয়ে তারা আরো অসংখ্য মাছের পোনা নষ্ট করে ফেলে, যা মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। কৃষিকাজের জন্য একদা বহুল ব্যবহৃত মহিষ এখন বিলুপ্ত প্রায়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত চারণভূমির অভাবে গবেষণা এলাকা বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার পদ্মা গ্রামের কোনো কৃষক পরিবারই এখন আর মহিষ পালন করেন না বলে কৃষকরা জানান। এক যুগপূর্বেও প্রতি কৃষক পরিবারেই পাবিারিক দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য গাভী পালন করা হতো। বর্তমানে লবণাক্ততার কারণে ও পশুচারণ ভূমির অভাবে তারা গাভী পালন তো দূরের কথা চাষের জন্য ব্যবহৃত গরু পালন করতেও পারছেন না। ফলে তারা, ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকদের সঙ্গে আলাপকালে জনান যায়, এখন কৃষি কাজের জন্য যান্ত্রিক উপায়ের উপরই বেশি নির্ভরশীল। কৃষকরা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে দিন দিন যান্ত্রিক চাষাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, যা প্রকারান্তরে পরিবেশ দূষিত করছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০০৭ সালের সুপার সাইকোন সিডরের পর প্রায় সকল কৃষকই (৯১.১৫%) ট্রাক্টর ভাড়া নিয়ে জমি চাষাবাদ করেছেন। ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকরা আরও জানান যে, বর্তমানে জমিতে অধিক আগাছা দেখা দিচ্ছে। এতে ফলন কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে অনেকেই কৃষি পেশায় নিরুৎসাহিত হয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছেন। তাদের গ্রামে এরকম ২০-২৫ জন কৃষক কৃষি পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা বিশেষ করে ব্যবসা, রিক্সা ভ্যান এবং দেশীয় যন্ত্রচালিত যানবাহন চালানোর মাধ্যমে মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন বলে কৃষকরা জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কৃষকরা জানান যে, জলবায়ু পরিবর্তন তারা বোঝেন না। তবে, আবহাওয়া যে আগের মতো নেই সেটা বুঝতে পারেন। শীতকালের স্থায়িত্ব কম হচ্ছে। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপদাহের সৃষ্টি হচ্ছে। ধান চাষের জন্য যখন বৃষ্টির প্রয়োজন তখন সেটা না হয়ে বৃষ্টি বিলম্বিত হচ্ছে। আবার কখনও কখনও অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়ে ফসল ডুবে যাচ্ছে। কৃষকরা জানান যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নেই। তবে তারা লক্ষ্য করছেন যে, নদীতে জোয়ারের পানি আগের তুলনায় বেশি হচ্ছে এবং নদী ও সাগরে পানির চাপ বেশি। এজন্য বেড়ি বাধের বাইরে কোন শস্য চাষ করলে তা যে কোন সময়ে তলিয়ে যায়। যেটা কিনা ১০-১৫ বছরের আগেও হতো না। এজন্য কৃষকরা ঐসব এলাকার জমি চাষাবাদ না করে জমি পতিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।

১৯ মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম,"বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুত ব্যক্তিবর্গ" সমাজ নিরীক্ষণ, নং ৯৬ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬।

আশ্রয়কেন্দ্র কৃষকদের ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে কৃষকদের নিকট একটি বিরাট অবলম্বন। কাছাকাছি (দুই কিলোমিটারের মধ্যে) আশ্রয় কেন্দ্র না থাকলে, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে প্রান্তিক কৃষকরা উঁচু রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা নিজ শক্ত বাসস্থান কিংবা শহরে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার মাত্রা বেশি হওয়ার কারনে অনেকেই নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে শহরে বসতি স্থাপন করার চিন্তা-ভাবনাও করছেন। ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকার কৃষকদের সাথে আলাপকালে তারা জানান যে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় তারা উঁচু ও নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর অবস্থান তাদের বাড়ির ৫-৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায় অধিকাংশ সময় তারা সেখানে যেতে চাইলেও যেতে পারেন না। তারা বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলো জনবসতির ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে নির্মাণ করা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে উক্ত পদ্মা গ্রামে বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় বলেশ্বর নদী ও বঙ্গোপসাগর মোহনা থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরত্বে একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যেটি অব্যাহত ভাঙনের মুখে যে কোনো সময়ে নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। কৃষকরা আরও মত প্রকাশ করেন যে, ঘূর্ণিঝড় শুরু হলে মানুষ সাগরের দিকে না যেয়ে বরং মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে সাগর পাড়ে ফলে এখানে আশ্রয়ের জন্য এখানে যেতে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে না। উপরন্ত এটি অব্যাহত ভাঙনের মুখে পড়ে নদীনর্ভে বিলীন হতে চলেছে। উপকূলীয় এলাকায় এ ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে এ বিষয়গুলো ভেবে দেখা দরকার বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। নইলে সম্পদের অপচয় হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও উপদ্রুত এলাকার মানুষ সময় বিপদের মধ্যেই থেকে যাবেন। মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির পাশপাশি গবাদিপশুর উপযোগী আশ্রয় কেন্দ্র বা কেল-া তৈরি করাও প্রয়োজন বলে কৃষকরা মন্তব্য করেন। কেননা অনেক কৃষক গবাদি পশু ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চান না। ফলে তারা বিপদের সম্মুখীন হন এবং জীবন ও সম্পত্তি হারান।

ঘূর্ণিঝড় ও তৎপরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পাওয়া গেলেও তা পর্যাপ্ত নয়। উপরন্ত বিতরণ প্রক্রিয়াও অনেক সময়ই স্বচ্ছ থাকে না ফলে প্রকৃত প্রয়োজন যাদের তারা না পেয়ে অপোকৃত সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এসব সহায়তা পেয়ে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পেলেও তারা নিজেরাই গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও ধার করে টাকা জোগাড় করে বাড়িঘর মেরামত ও জরুরি প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে কৃষিকাজ পুনরায় শুরু করা একটি বিরাট সমস্যা। জমিতে লবনের আস্থরণ সরানো কৃষকদের জন্য দুরূহ ব্যাপার। এছাড়া, চাষের জন্য বলদ সংগ্রহ করা ও শস্যের বীজ প্রাপ্তিও সহজসাধ্য নয় বলে তারা উলে-খ করেন। বর্তমানে এলাকায় লোনা পানি ঢুকে যাওয়ার কারনে লোনা পানির উপযোগী শস্য এবং পরিবর্তিত পরিবেশে যে সব খাদ্য-শস্য ফলে সেগুলো চাষ করে নিজেদের টিকিয়ে রাখা চেষ্টা করছেন। যেমন-আগে যে জমিতে ধান চাষ করা হতো এখন সেখানে তরমুজ চাষ করছেন।

২০০৭ সালে আঘাতকৃত সুপার সাইকোন সিডরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন কৃষক বলেন যে, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত আবহাওয়ার সংবাদ এখনও অধিকাংশ কৃষকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। তারা মনে করেন, ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়ার সংবাদ স্থানীয় জনগণের নিকট বোধগম্য ভাষায় প্রচার করা উচিত। কেননা

এখনও বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের পরিবারসহ অধিকাংশ কৃষক পরিবারগুলোর সদস্যগণ অশিতি। তাদের অনেকেরই এখনও সংবাদ মাধ্যমের সুযোগ নেই। আর থাকলেও তারা বোঝেন না ৫-১০ ফুট উচ্চতার পানি এবং ১৪০-১৮০ কিলোমিটার বেগে আসা ঝড় কতটুক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন উলে-খসহ আবহাওয়ার সতর্কবাণী প্রচার করা উচিৎ বলে কৃষকরা মন্তব্য করেন। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই মোবাইল ফোন রয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপযোগী করে ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত প্রদান করা হলে তা সহজেই সকলের নিকট পৌঁছে যাবে। অভিযোজন প্রক্রিয়া সহজতর করতে ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করেন। ১) উপকূলীয় এলাকায় যেসব এলকায় বাধ নেই সে সব এলাকায় বাধ নির্মাণ এবং বাধ থাকলে তা রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ; ২) নারী-পুরুষদের জন্য অলাদা উপযুক্ত সুবিধাসহ সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান; ৩) লবনাক্ততা সহনীয় ফসলের জাত উদ্ভাবনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ; ৪) হাঁস পালনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সরকারি-বেসরকারি সহায়তাদান; ৫) বৃষ্টির পানি সংরণে অবকাঠামো নির্মাণে কৃষক পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান; ৬) লবনাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকরণ অথবা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্থান্তরে সহায়তা প্রদান; ৭) ঘূর্ণিঝড় সহনীয় বাড়ি তৈরিতে ঋণ বা আর্থিক সমতা বিবেচনায় এনে মঞ্জুরি সহায়তা প্রদান। উলি-খিত বিষয়গুলোতে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা হলে উপকূলীয় কৃষকদের জীবনাযাত্রা সহনীয় হবে বলে কৃষকরা মনে করেন।

৬.০ উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

১৯৬০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্থান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপ উপকূলীয় এলাকাকে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং লোনা পানি প্রবেশ থেকে রা করার জন্য বেশ কিছু বড় আকারের পোল্ডার এবং এমব্যাঙ্কমেন্ট নির্মান করেণ।[২০] ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে প্রতিবেদনটি তৈরি করে, তাতে খাপ খাওয়ানোর জন্য বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার উপকূলীয় এলাকার মানুষকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রা করে বটে তবে সেগুলো যথাযথভাবে পরিচর্যা করা প্রয়োজন বলে কৃষকগণ মনে করেন। পদ্মা গ্রামের পশ্চিম দিকের বেড়িবাঁধটি সংস্কার না করার কারেনে সিডরের সময় সহসাই পানি ঢুকে পুরো গ্রামকে তলিয়ে দেয়। এতে শত শত মানুষের বসতবাড়ি জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধন হয় বলে কৃষকরা জানান।

১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিলের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আহবায়ক করে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন মোতাবেক দেশের ১৫টি উপকূলীয় জেলার ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকায় ১ কোটি ২০ লাখ লোক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। সে অনুযায়ী দুর্যোগের সময়ে উক্ত এলাকার লোকজনের নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চিত করতে ৩২ হাজার ৬০০টি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে মাত্র দুই হাজারের মত।[২১] যা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের

২০ Sam Jenkins, Alamgir Chowdhury & Mahbub Hossain,"Impact of Small Sacle Coastal Embankment: A Case study of LGED Polder," The Journal of Rural Development, vol.34, no.2[July 2007]:56.

২১ দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্ত রণাবেণ না হওয়ায় এগুলো প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া, মহিলাদের জন্য আলাদা স্যানিটারি ব্যবস্থা না থাকায় মহিলারা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উৎসাহ বোধ করেন না। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা স্যানিটারি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এগুলো রণাবেণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে কৃষকরা মনে করেন। অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে স্যানিটারি ব্যবস্থা থাকে নীচতলায় যেটি ঝূর্ণিঝড়ের সময়ে সাধারণত তলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে নকশায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে কৃষকরা মনে করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় তালায়ই এসব সুযোগ-সুবিধা রাখা প্রয়োজন বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

৭.০ উপসংহার

ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে একটি দুর্যোগ-প্রবণ এলাকা। বিশ্বজলবায়ুপরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর সারসরি শিকার এদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষ। জানমালের ব্যাপক ক্ষয়তির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। কেননা, কেউ কেউ মৎসজীবি হলেও কৃষিই উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা। বিশ্ব জলায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন নির্গমনে বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্য হলেও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারি মানুষকে তার চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক উদ্যোগ হিসাবে কিয়োটো প্রটোকল এর পরবর্তী চুক্তি এখনও পর্যন্ত সম্পাদিত না হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। কিয়োটো প্রটোকলের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ২০১২ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহের (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন) নির্গমন ৫ শতাংশ কমিয়ে ১৯৯০ সালের পর্যায়ে আনা। কিন্তু বাস্তবে ২০১২ সালে এসব গ্যাসের নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেড়েছে। ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আর এর বিরূপ প্রভাবগুলো ক্রমেই বেশি করে দেখা দিচ্ছে। বর্তমান দশকে যে কয়টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে তা ঘটার সময়ের ব্যবধান ও বেগের দিক থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। এক দশক পূর্বেও আবহাওয়ায় এত বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। এতে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। যার দায়ভার বর্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন নির্গমনকারী উন্নত দেশগুলোর উপর। তাদেরই উচিত বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া, কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিপর্যয় থেকে রা করতে কৃষক সম্প্রদায়ের অভিযোজন কৌশলে সহায়ক কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা বাংলাদেশর উপকূলে বসবাসকারী কৃষকদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে কৃষিজীবি মানুষ প্রকৃতির নির্মম রুদ্ররোষের কবলে পড়ে জীবন-জীবিকা হারাবে ও বাস্তচ্যুত হবে। দেশ সম্মুখীন হবে খাদ্য সংকটের এবং দেখা দিবে মানবিক বিপর্যয়। এজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগই বাংলাদেশের কৃষকদের জীবন ও জীবিকা রায় ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

Abrar, Chowdhury R and S Nurullah Azad ed., Coping with Displacement: Riverbank Erosion in North-West Bangladesh, Dhaka: RMMRU and RDRS Bangladesh/ North Bengal Institute, 2004

Ahmed, A.U. "Adaptability of Bangladesh's Crop Agriculture to Climate Change: Possibilities and Limitations." Asia Pacific Journal on Environment and Development 7, no. 1 (2000): 71-93.

Alam, Edris. "Coping with Cyclone: An Occupational Group Perspective." Journal of the Asiatic Society of Bangladesh Humanities 48, no.2 (Dec. 2003): 59-74.

Chowdhury, M. I. "Shape of Bangladesh through Ages". Journal of Bangladesh National Geographical Association 2, no.1 and 2 (1974): 1-12.

Gain, A. K. & M. A. Bari,"Effect of Environmental Degradation on National Security of Bangladesh," Asia Pacific Journal on Environment and Development, vol. 14, no.2, December 2007.

Hossain, Hameeda, C.P Dodge and F.H Bed, ed. From Crisis to Development: Coping With Disasters in Bangladesh. Dhaka: UPL, 1992.

Islam, Md. Where Land Meets the Sea: A Profile of Coastal Zones of Bangladesh. Dhaka: UPL, 2004.

Jenkins, Sam; Alamgir Chowdhury & Mahbub Hossain,"Impact of Small Sacle Coastal Embankment: A Case study of LGED Polder," The Journal of Rural Development, vol.34, no.2, July 2007.

Talukder, Joyotimoy, Gauranga Deb Roy & Mohiuddin Ahmad, Living with Cyclone: Study on Storm Surge Prediction and Disaster Preparedness, Dhaka: Community Development Library, 1993.

গাজী তানজিয়া,"জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘণ্টাধ্বনি," দৈনিক যায় যায় দিন, ১৩ জুন ২০০৮, পৃ. ১৭।

জসিম উদ্দিন, এম. "উপকূলের কোটি মানুষের জীবন ঝুঁকিমুক্ত কবে হবে?," দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০৭, পৃ.১৩।

ধীরাজ কুমার নাথ, "বায়ু পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদন", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ৮৫-৮৮।

মাহফুজ উল-াহ,"জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ২৭৩-৭৬।

মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম,"বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্থচ্যুত ব্যক্তিবর্গ" সমাজ নিরীক্ষণ, নং ৯৬ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬।

মোর্শেদ, এস. এম. "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ২৮৭-৯০।

বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯, ঢাকা: অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ২০১০।